বিদ্যাসাগর চরিত

স্বরচিত

শ্রীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত

কলিকাতা

সংস্কৃত যন্ত্র।

সংবৎ ১৯৪৮।

PUBLISHED BY THE CALCUTTA LIBRARY,

No. 25, SUKEAS' STREET, CALCUTTA.

1891.

বিজ্ঞাপন

পিতৃদেব, পূজ্যপাদ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, স্বীয় "আত্ম-জীবনচরিত" লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু নিতান্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, সম্পূর্ণ করা দূরে থাকুক, দুই পরিচ্ছেদের অধিক তিনি লিখিয়া যাইতে পারেন নাই। শারীরিক অসুস্থতা ও নানাকার্য্যে ব্যস্ততা নিবন্ধন তাঁহার অনেক আরব্ধ গ্রন্থ অসমাপ্ত পড়িয়া আছে। তাঁহার আত্ম-জীবনচরিতও তাহাদের অন্যতম।

"আত্মজীবনচরিতের" অতি অল্প ভাগই তিনি লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত, ও স্বীয় শৈশবের সামান্য বিবরণ মাত্র, এই দুই পরিচ্ছেদে লিপিবদ্ধ আছে। যদি তিনি, বিধবাবিবাহের আন্দোলনের সময় পর্য্যন্ত, অন্ততঃ তাঁহার কর্ম্ম-জীবনের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত, লিখিয়া যাইতে পারিতেন, তাহা হইলেও আমরা পর্য্যাপ্ত মনে করিতাম। কারণ, তাহার পর হইতে তিনি সমাজে বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইয়াছিলেন, এবং পরবর্ত্তী জীবনে, তিনি অনেকের ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আসিয়াছিলেন।

সুতরাং, সে সময়ের ঘটনা-পরম্পরা, তিনি নিজে না লিখিয়া গেলেও, জানিবার সম্ভাবনা ছিল। যদি তিনি তাঁহার ছাত্রজীবনের ইতিহাস নিজে লিখিয়া যাইতে পারিতেন, তাহা হইলেও তাঁহার জীবনচরিত সম্পূর্ণ করা সহজ হইত।

তিনি, প্রায়ই, আত্মীয় ও বান্ধবগণের নিকটে, স্বীয় জীবনের অনেক ঘটনার গল্প করিতেন; আমরাও নানাসূত্রে কিছু কিছু অবগত আছি। তদ্ভিন্ন, স্বর্গীয় পিতৃদেব, অনেক কাগজ পত্র রাখিয়া গিয়াছেন। সেই সমুদয় অবলম্বন করিয়া ভবিষ্যতে তাঁহার জীবনচরিত লিখিত হইতে পারিবেক। কিন্তু তিনি নিজে লিখিলে যেরূপ হইত, আর কিছুতেই সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই, ইহা অল্প আক্ষেপের বিষয় নহে।

আমাদের ইচ্ছা ছিল, ভবিষ্যতে যখন আমরা তাঁহার জীবনচরিত ও চিঠিপত্র প্রকাশিত করিব, তখন, তাহার প্রারম্ভ ভাগে, তাঁহার আত্মজীবনচরিতের এই দুইটি পরিচ্ছেদ গ্রথিত করিয়া দিব। কিন্তু, স্বর্গীয় পিতৃদেবের আত্মীয় স্বজনগণ, ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছিলেন যে, তিনি আত্মজীবনচরিত লিখিতেছেন। তাঁহাদের ইচ্ছা ও অনুরোধ এই যে, তিনি যতটুকু লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, আপাততঃ তাহাই

প্রকাশিত হউক। তদনুরোধে, তদীয় আত্মজীবনচরিতের এই দুই পরিচ্ছেদ এত শীঘ্র প্রকাশিত হইল।

এই দুই পরিচ্ছেদ "বিদ্যাসাগর চরিত" নামে অভিহিত হইল। আপাততঃ এই স্বল্পপরিমিত আত্মজীবনচরিত তদীয় জীবনচরিতের প্রথম অংশ স্বরূপ পরিগণিত হইবে। ভবিষ্যতে, তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট ভাগের বিবরণ, স্বতন্ত্র প্রকাশিত হইবে।

কলিকাতা
৯ই আশ্বিন। সংবৎ ১৯৪৮। } শ্রীনারায়ণ শর্ম্মা।
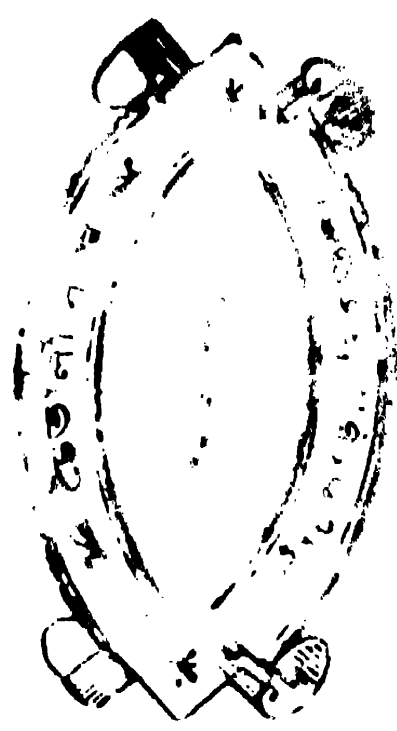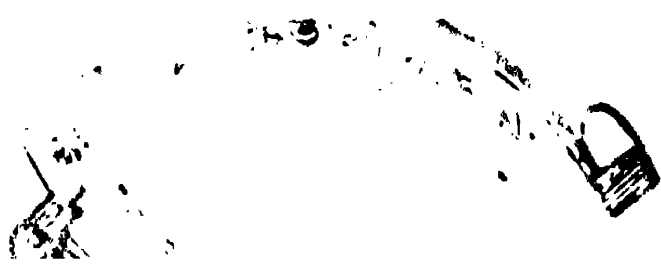
বিদ্যাসাগর চরিত

প্রথম পরিচ্ছেদ

শকাব্দাঃ ১৭৪২, ১২ই আশ্বিন, মঙ্গলবার, দিবা দ্বিপ্রহরের সময়, বীরসিংহগ্রামে আমার জন্ম হয়। আমি জনকজননীর প্রথম সন্তান।

বীরসিংহের আধ ক্রোশ অন্তরে, কোমরগঞ্জ নামে এক গ্রাম আছে; ঐ গ্রামে, মঙ্গলবারে ও শনিবারে, মধ্যাহ্নসময়ে, হাট বসিয়া থাকে। আমার জন্ম সময়ে, পিতৃদেব বাটীতে ছিলেন না; কোমর-গঞ্জে হাট করিতে গিয়াছিলেন। পিতামহদেব তাঁহাকে আমার জন্মসংবাদ দিতে যাইতেছিলেন; পথিমধ্যে, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে, বলিলেন, "একটি এঁড়ে বাছুর হইয়াছে"। এই সময়ে, আমাদের বাটীতে, একটি গাই গর্ভিণী ছিল; তাহারও, আজ

কাল, প্রসব হইবার সম্ভাবনা। এজন্য, পিতামহ-দেবের কথা শুনিয়া, পিতৃদেব মনে করিলেন, গাইটি প্রসব হইয়াছে। উভয়ে বাটীতে উপস্থিত হইলেন। পিতৃদেব, এঁড়ে বাছুর দেখিবার জন্য, গোয়ালের দিকে চলিলেন। তখন পিতামহদেব হাস্যমুখে বলিলেন, "ও দিকে নয়, এ দিকে এস ; আমি তোমায় এঁড়ে বাছুর দেখাইয়া দিতেছি"। এই বলিয়া, সুতিকা গৃহে লইয়া গিয়া, তিনি এঁড়ে বাছুর দেখাইয়া দিলেন।

এই অকিঞ্চিৎকর কথার উল্লেখের তাৎপর্য্য এই যে, আমি বাল্যকালে, মধ্যে মধ্যে, অতিশয় অবাধ্য হইতাম। প্রহার ও তিরস্কার দ্বারা, পিতৃদেব আমার অবাধ্যতা দূর করিতে পারিতেন না। ঐ সময়ে, তিনি, সন্নিহিত ব্যক্তিদের নিকট, পিতামহদেবের পূর্ব্বোক্ত পরিহাস বাক্যের উল্লেখ করিয়া, বলিতেন, "ইনি সেই এঁড়ে বাছুর ; বাবা পরিহাস করিয়াছিলেন, বটে ; কিন্তু, তিনি সাক্ষাৎ ঋষি ছিলেন ; তাঁহার পরিহাস বাক্যও বিফল হইবার নহে ; বাবাজি আমার, ক্রমে, এঁড়ে গরু অপেক্ষাও একগুঁইয়া

হইয়া উঠিতেছেন"। জন্ম সময়ে, পিতামহদেব, পরিহাস করিয়া, আমায় এঁড়ে বাছুর বলিয়াছিলেন; জ্যোতিষশাস্ত্রের গণনা অনুসারে, বৃষরাশিতে আমার জন্ম হইয়াছিল; আর, সময়ে সময়ে, কার্য্য দ্বারাও, এঁড়ে গরুর পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ, আমার আচরণে, বিলক্ষণ আবির্ভূত হইত।

বীরসিংহগ্রামে আমার জন্ম হইয়াছে; কিন্তু, এই গ্রাম আমার পিতৃপক্ষীয় অথবা মাতৃপক্ষীয় পূর্ব্ব পুরুষদিগের বাসস্থান নহে। জাহানাবাদের ঈশান কোণে, তথা হইতে প্রায় তিন ক্রোশ অন্তরে, বনমালিপুর নামে যে গ্রাম আছে, উহাই আমার পিতৃপক্ষীয় পূর্ব্ব পুরুষদিগের বহুকালের বাসস্থান। যে ঘটনাসূত্রে, পূর্ব্বপুরুষদিগের বাসস্থানে বিসর্জন দিয়া, বীরসিংহ গ্রামে আমাদের বসতি ঘটে, তাহা সংক্ষেপে উল্লিখিত হইতেছে।

প্রপিতামহদেব ভুবনেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের পাঁচ সন্তান; জ্যেষ্ঠ নৃসিংহরাম, মধ্যম গঙ্গাধর, তৃতীয় রামজয়, চতুর্থ পঞ্চানন, পঞ্চম রামচরণ। তৃতীয় রামজয় তর্কভূষণ আমার পিতামহ। বিদ্যালঙ্কার

মহাশয়ের দেহাত্যয়ের পর, জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম, সংসারে কর্ত্তৃত্ব করিতে লাগিলেন। সামান্য বিষয় উপলক্ষে, তাঁহাদের সহিত কথান্তর উপস্থিত হইয়া, ক্রমে বিলক্ষণ মনান্তর ঘটিয়া উঠিল। জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম সহোদরের অবমাননাব্যঞ্জক বাক্যপ্রয়োগে, তদীয় অন্তঃকরণ নিরতিশয় ব্যথিত হইল। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া, তিনি কতিপয় দিবস অতিবাহিত করিলেন; অবশেষে, আর এস্থানে অবস্থিতি করা, কোনও ক্রমে, বিধেয় নহে, এই সিদ্ধান্ত করিয়া, কাহাকেও কিছু না বলিয়া, এককালে, দেশত্যাগী হইলেন।

বীরসিংহগ্রামে, উমাপতি তর্কসিদ্ধান্ত নামে অতি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। ব্যাকরণে সবিশেষ পারদর্শিতা বশতঃ, তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়, রাঢ়দেশে অদ্বিতীয় বৈয়াকরণ বলিয়া, পরিগণিত হইয়াছিলেন। এরূপ কিংবদন্তী আছে, মেদিনীপুরের প্রসিদ্ধ ধনী চন্দ্রশেখর ঘোষ, মহাসমারোহে, মাতৃশ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন। শ্রাদ্ধসভায়, নবদ্বীপের প্রধান নৈয়ায়িক প্রসিদ্ধ শঙ্কর তর্কবাগীশ পর্য্যন্ত উপস্থিত হইয়াছিলেন। তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়, স্বীয় ব্যাকরণবিদ্যার

বিশিষ্টরূপ পরিচয় দিয়া, তর্কবাগীশ মহাশয়কে সাতিশয় সন্তুষ্ট করেন। তর্কবাগীশ মহাশয়, মুক্ত-কণ্ঠে, সাধুবাদপ্রদান, ও সবিশেষ আদর সহকারে, আলিঙ্গনদান, করিয়াছিলেন। এই ঘটনা দ্বারা, তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়, সর্ব্বত্র, যারপর নাই, মাননীয় ও প্রশংসনীয় হইয়াছিলেন। রামজয় তর্কভূষণ এই উমাপতি তর্কসিদ্ধান্তের তৃতীয়া কন্যা দুর্গাদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। দুর্গাদেবীর গর্ভে, তর্কভূষণ মহাশয়ের, দুই পুত্র ও চারি কন্যা জন্মে। জ্যেষ্ঠ ঠাকুরদাস, কনিষ্ঠ কালিদাস; জ্যেষ্ঠা মঙ্গলা, মধ্যমা কমলা, তৃতীয়া গোবিন্দমণি, চতুর্থী অন্নপূর্ণা। জ্যেষ্ঠ ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আমার জনক।

রামজয় তর্কভূষণ দেশত্যাগী হইলেন; দুর্গাদেবী, পুত্র কন্যা লইয়া, বনমালিপুরের বাটীতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই, দুর্গাদেবীর লাঞ্ছনাভোগ, ও তদীয় পুত্র কন্যাদের উপর কর্ত্তৃ-পক্ষের অযত্ন ও অনাদর, এত দূর পর্য্যন্ত হইয়া উঠিল, যে দুর্গাদেবীকে, পুত্রদ্বয় ও কন্যাচতুষ্টয় লইয়া, পিত্রালয় যাইতে হইল। তদীয় ভ্রাতৃশ্বশুর প্রভৃতির

আচরণের পরিচয় পাইয়া, তাঁহার পিতা, মাতা, ভ্রাতা প্রভৃতি সাতিশয় দুঃখিত হইলেন, এবং তাঁহার ও তাঁহার পুত্রকন্যাদের উপর যথোচিত স্নেহপ্রদর্শন করিতে লাগিলেন। কতিপয় দিবস অতি সমাদরে অতিবাহিত হইল। দুর্গাদেবীর পিতা, তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়, অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছিলেন; এজন্য, সংসারের কর্ত্তৃত্ব তদীয় পুত্র রামসুন্দর বিদ্যাভূষণের হস্তে ছিল। সুতরাং, তিনিই বাটীর প্রকৃত কর্ত্তা, ও তাঁহার গৃহিণীই বাটীর প্রকৃত কর্ত্রী। দেশাচার অনুসারে, তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী, তৎকালে, সাক্ষিগোপাল স্বরূপ ছিলেন; কোনও বিষয়ে তাঁহাদের কর্ত্তৃত্ব খাটিত না; সাংসারিক সমস্ত ব্যাপার, রামসুন্দর ও তাঁহার গৃহিণীর অভিপ্রায় অনুসারেই, সম্পাদিত হইত।

কিছু দিনের মধ্যেই, পুত্র কন্যা লইয়া, পিত্রালয়ে কালযাপন করা দুর্গাদেবীর পক্ষে বিলক্ষণ অসুখের কারণ হইয়া উঠিল। তিনি ত্বরায় বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার ভ্রাতা ও ভ্রাতৃভার্য্যা তাঁহার উপর অতিশয় বিরূপ; অনিয়ত কালের জন্যে, সাতজনের ভরণ-

পোষণের ভারবহনে, তাঁহারা, কোনও মতে, সম্মত নহেন। তাঁহারা দুর্গাদেবী ও তদীয় পুত্রকন্যাদিগকে গলগ্রহবোধ করিতে লাগিলেন। রামসুন্দরের বনিতা, কথায় কথায়, দুর্গাদেবীর অবমাননা করিতে আরম্ভ করিলেন। যখন নিতান্ত অসহ্য বোধ হইত, দুর্গাদেবী স্বীয় পিতা তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়ের গোচর করিতেন। তিনি, সাংসারিক বিষয়ে, বার্দ্ধক্য নিবন্ধন ঔদাসীন্য অথবা কর্ত্তৃত্ববিরহ বশতঃ, কোনও প্রতিবিধান করিতে পারিতেন না। অবশেষে, দুর্গাদেবীকে, পুত্রকন্যা লইয়া, পিত্রালয় হইতে বহির্গত হইতে হইল। তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় সাতিশয় ক্ষুব্ধ ও দুঃখিত হইলেন, এবং স্বীয় বাটীর অনতিদূরে, এক কুটীর নির্ম্মিত করিয়া দিলেন। দুর্গাদেবী, পুত্রকন্যা লইয়া, সেই কুটীরে অবস্থিতি ও অতি কষ্টে দিনপাত করিতে লাগিলেন।

ঐ সময়ে, টেকুয়া ও চরখায় সুত কাটিয়া, সেই সুত বেচিয়া, অনেক নিঃসহায় নিরুপায় স্ত্রীলোক আপনাদের গুজরান করিতেন। দুর্গাদেবী সেই বৃত্তি অবলম্বন করিলেন। তিনি, একাকিনী হইলে,

অবলম্বিত বৃত্তি দ্বারা, অবলীলাক্রমে, দিনপাত করিতে পারিতেন। কিন্তু, তাদৃশ স্বল্প আয় দ্বারা, নিজের, দুই পুত্রের, ও চারি কন্যার ভরণপোষণ সম্পন্ন হওয়া সম্ভব নহে। তাঁহার পিতা, সময়ে সময়ে, যথাসম্ভব, সাহায্য করিতেন; তথাপি তাঁহাদের, আহারাদি সর্ব্ববিষয়ে, ক্লেশের পরিসীমা ছিল না। এই সময়ে, জ্যেষ্ঠ পুত্র ঠাকুরদাসের বয়ঃক্রম ১৪। ১৫ বৎসর। তিনি, মাতৃদেবীর অনুমতি লইয়া, উপার্জ্জনের চেষ্টায়, কলিকাতা প্রস্থান করিলেন।

সভারাম বাচস্পতি নামে আমাদের এক সন্নিহিত জ্ঞাতি কলিকাতায় বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র, জগন্মোহন ন্যায়ালঙ্কার, সুপ্রসিদ্ধ চতুর্ভুজ ন্যায়রত্নের নিকট অধ্যয়ন করেন। ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়, ন্যায়রত্ন মহাশয়ের প্রিয়শিষ্য ছিলেন; তাঁহার অনুগ্রহে ও সহায়তায়, কলিকাতায় বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হয়েন। ঠাকুরদাস, এই সন্নিহিত জ্ঞাতির আবাসে উপস্থিত হইয়া, আত্মপরিচয় দিলেন, এবং কি জন্যে আসিয়াছেন, অশ্রুপূর্ণলোচনে তাহা ব্যক্ত

করিয়া, আশ্রয়প্রার্থনা করিলেন। ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের সময় ভাল, অকাতরে অন্নব্যয় করিতেন; এমন স্থলে, দুর্দ্দশাপন্ন আসন্ন জ্ঞাতিসন্তানকে অন্ন দেওয়া দুরূহ ব্যাপার নহে। তিনি, সাতিশয় দয়া ও সবিশেষ সৌজন্য প্রদর্শন পূর্ব্বক, ঠাকুরদাসকে আশ্রয়প্রদান করিলেন।

ঠাকুরদাস, প্রথমতঃ বনমালিপুরে, তৎপরে বীরসিংহে, সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ পড়িয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি, ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে, রীতিমত সংস্কৃত বিদ্যার অনুশীলন করিবেন, প্রথমতঃ এই ব্যবস্থা স্থির হইয়াছিল, এবং তিনিও তাদৃশ অধ্যয়ন বিষয়ে, সবিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। কিন্তু, যে উদ্দেশে, তিনি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, সংস্কৃতপাঠে নিযুক্ত হইলে, তাহা সম্পন্ন হয় না। তিনি, সংস্কৃত পড়িবার জন্য, সবিশেষ ব্যগ্র ছিলেন, যথার্থ বটে; এবং সর্ব্বদাই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিতেন, যত কষ্ট, যত অসুবিধা হউক না কেন, সংস্কৃতপাঠে প্রাণপণে যত্ন করিব। কিন্তু, জননীকে ও ভাই ভগিনীগুলিকে কি অবস্থায় রাখিয়া

আসিয়াছেন, যখন তাহা মনে হইত, তখন সে ব্যগ্রতা ও সে প্রতিজ্ঞা, তদীয় অন্তঃকরণ হইতে, একবারে অপসারিত হইত। যাহা হউক, অনেক বিবেচনার পর, অবশেষে ইহাই অবধারিত হইল, যাহাতে তিনি শীঘ্র উপার্জনক্ষম হন, সেরূপ পড়া শুনা করাই কর্ত্তব্য।

এই সময়ে, মোটামুটি ইঙ্গরেজী জানিলে, সওদাগর সাহেবদিগের হৌসে, অনায়াসে কর্ম্ম হইত। এজন্য, সংস্কৃত না পড়িয়া, ইঙ্গরেজী পড়াই, তাঁহার পক্ষে, পরামর্শসিদ্ধ স্থির হইল। কিন্তু, সে সময়ে, ইঙ্গরেজী পড়া সহজ ব্যাপার ছিল না। তখন, এখনকার মত, প্রতি পল্লীতে ইঙ্গরেজী বিদ্যালয় ছিল না। তাদৃশ বিদ্যালয় থাকিলেও, তাঁহার ন্যায় নিরুপায় দীন বালকের তথায় অধ্যয়নের সুবিধা ঘটিত না। ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের পরিচিত এক ব্যক্তি কার্য্যোপযোগী ইঙ্গরেজী জানিতেন। তাঁহার অনুরোধে, ঐ ব্যক্তি ঠাকুরদাসকে ইঙ্গরেজী পড়াইতে সম্মত হইলেন। তিনি বিষয়কর্ম্ম করিতেন; সুতরাং, দিবাভাগে, তাঁহার পড়াইবার অবকাশ ছিল না।

এজন্য, তিনি ঠাকুরদাসকে, সন্ধ্যার সময়, তাঁহার নিকটে যাইতে বলিয়া দিলেন। তদনুসারে, ঠাকুর-দাস, প্রত্যহ সন্ধ্যার পর, তাঁহার নিকটে গিয়া, ইঙ্গরেজী পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের বাটীতে, সন্ধ্যার পরেই, উপরিলোকের আহারের কাণ্ড শেষ হইয়া যাইত। ঠাকুরদাস, ইঙ্গরেজী পড়ার অনুরোধে, সে সময়ে উপস্থিত থাকিতে পারিতেন না; যখন আসিতেন, তখন আর আহার পাইবার সম্ভাবনা থাকিত না; সুতরাং, তাঁহাকে রাত্রিতে অনাহারে থাকিতে হইত। এইরূপে নক্তন্তন আহারে বঞ্চিত হইয়া, তিনি, দিন দিন, শীর্ণ ও দুর্ব্বল হইতে লাগিলেন। এক দিন, তাঁহার শিক্ষক জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি এমন শীর্ণ ও দুর্ব্বল হইতেছ, কেন। তিনি, কি কারণে তাঁহার সেরূপ অবস্থা ঘটিতেছে, অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাহার পরিচয় দিলেন। ঐ সময়ে, সেই স্থানে, শিক্ষকের আত্মীয় শূদ্রজাতীয় এক দয়ালু ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া, তিনি অতিশয় দুঃখিত হইলেন, এবং ঠাকুরদাসকে

বলিলেন, যেরূপ শুনিলাম, তাহাতে আর তোমার ওরূপ স্থানে থাকা কোনও মতে চলিতেছে না। যদি তুমি রাঁধিয়া খাইতে পার, তাহা হইলে, আমি তোমায় আমার বাসায় রাখিতে পারি। এই সদয় প্রস্তাব শুনিয়া, ঠাকুরদাস, যার পর নাই, আহ্লাদিত হইলেন, এবং, পর দিন অবধি, তাঁহার বাসায় গিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

এই সদাশয় দয়ালু মহাশয়ের দয়া ও সৌজন্য যেরূপ ছিল, আয় সেরূপ ছিল না। তিনি, দালালি করিয়া, সামান্যরূপ উপার্জন করিতেন। যাহা হউক, এই ব্যক্তির আশ্রয়ে আসিয়া, ঠাকুরদাসের, নির্বিঘ্নে, দুই বেলা আহার ও ইঙ্গরেজি পড়া চলিতে লাগিল। কিছু দিন পরে, ঠাকুরদাসের দুর্ভাগ্যক্রমে, তদীয় আশ্রয়দাতার আয় বিলক্ষণ খর্ব্ব হইয়া গেল; সুতরাং, তাঁহার নিজের ও তাঁহার আশ্রিত ঠাকুরদাসের, অতিশয় কষ্ট উপস্থিত হইল। তিনি, প্রতি দিন, প্রাতঃকালে, বহির্গত হইতেন, এবং কিছু হস্তগত হইলে, কোনও দিন দেড়প্রহরের, কোনও দিন দুই প্রহরের, কোনও দিন আড়াই প্রহরের সময়,

বাসায় আসিতেন; যাহা আনিতেন, তাহা দ্বারা, কোনও দিন বা কষ্টে, কোনও দিন বা সচ্ছন্দে, নিজের ও ঠাকুরদাসের আহার সম্পন্ন হইত। কোনও কোনও দিন, তিনি দিবাভাগে বাসায় আসিতেন না। সেই সেই দিন, ঠাকুরদাসকে, সমস্ত দিন, উপবাসী থাকিতে হইত।

ঠাকুরদাসের সামান্যরূপ এক খানি পিতলের থালা ও একটি ছোট ঘটী ছিল। থালাখানিতে ভাত ও ঘটীটিতে জল খাইতেন। তিনি বিবেচনা করিলেন, এক পয়সার সালপাত কিনিয়া রাখিলে, ১০। ১২ দিন ভাত খাওয়া চলিবেক; সুতরাং থালা না থাকিলে, কাজ আট্‌কাইবেক না; অতএব, থালাখানি বেচিয়া ফেলি; বেচিয়া যাহা পাইব, তাহা আপনার হাতে রাখিব। যে দিন, দিনের বেলায় আহারের যোগাড় না হইবেক, এক পয়সার কিছু কিনিয়া খাইব। এই স্থির করিয়া, তিনি সেই থালাখানি, নূতন বাজারে, কাঁসারিদের দোকানে বেচিতে গেলেন। কাঁসারিরা বলিল, আমরা অজানিত লোকের নিকট হইতে পুরাণ বাসন কিনিতে পারিব না। পুরাণ বাসন

কিনিয়া, কখনও কখনও, বড় ফেসাতে পড়িতে হয়। অতএব, আমরা তোমার থালা লইব না। এইরূপে কোনও দোকানদারই সেই থালা কিনিতে সম্মত হইল না। ঠাকুরদাস, বড় আশা করিয়া, থালা বেচিতে গিয়াছিলেন; এক্ষণে, সে আশায় বিসর্জন দিয়া, বিষণ্ণ মনে বাসায় ফিরিয়া আসিলেন।

এক দিন, মধ্যাহ্ন সময়ে, ক্ষুধায় অস্থির হইয়া, ঠাকুরদাস বাসা হইতে বহির্গত হইলেন, এবং অন্যমনস্ক হইয়া, ক্ষুধার যাতনা ভুলিবার অভিপ্রায়ে, পথে পথে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎ ক্ষণ ভ্রমণ করিয়া, তিনি অভিপ্রায়ের সম্পূর্ণ বিপরীত ফল পাইলেন। ক্ষুধার যাতনা ভুলিয়া যাওয়া দূরে থাকুক, বড়বাজার হইতে ঠনঠনিয়া পর্য্যন্ত গিয়া, এত ক্লান্ত ও ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় এত অভিভূত হইলেন, যে আর তাঁহার চলিবার ক্ষমতা রহিল না। কিঞ্চিৎ পরেই, তিনি এক দোকানের সম্মুখে উপস্থিত ও দণ্ডায়মান হইলেন; দেখিলেন, এক মধ্যবয়স্কা বিধবা নারী ঐ দোকানে বসিয়া মুড়ি মুড়কি বেচিতেছেন। তাঁহাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া, ঐ স্ত্রীলোক

জিজ্ঞাসা করিলেন, বাপাঠাকুর, দাঁড়াইয়া আছ কেন। ঠাকুরদাস, তৃষ্ণার উল্লেখ করিয়া, পানার্থে জলপ্রার্থনা করিলেন। তিনি, সাদর ও সস্নেহবাক্যে, ঠাকুর-দাসকে বসিতে বলিলেন, এবং ব্রাহ্মণের ছেলেকে সুধু জল দেওয়া অবিধেয়, এই বিবেচনা করিয়া, কিছু মুড়কি ও জল দিলেন। ঠাকুরদাস, যেরূপ ব্যগ্র হইয়া, মুড়কিগুলি খাইলেন, তাহা এক দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া, ঐ স্ত্রীলোক জিজ্ঞাসা করিলেন, বাপাঠাকুর, আজ বুঝি তোমার খাওয়া হয় নাই। তিনি বলিলেন, না, মা আজ আমি, এখন পর্য্যন্ত, কিছুই খাই নাই। তখন, সেই স্ত্রীলোক ঠাকুরদাসকে বলিলেন, বাপাঠাকুর জল খাইওনা, একটু অপেক্ষা কর। এই বলিয়া, নিকটবর্ত্তী গোয়ালার দোকান হইতে, সত্বর, দই কিনিয়া আনিলেন, এবং আরও মুড়কি দিয়া, ঠাকুরদাসকে পেট ভরিয়া ফলার করাইলেন; পরে, তাঁহার মুখে সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া, জিদ করিয়া বলিয়া দিলেন, যে দিন তোমার এরূপ ঘটিবেক, এখানে আসিয়া ফলার করিয়া যাইবে।

পিতৃদেবের মুখে এই হৃদয়বিদারণ উপাখ্যান শুনিয়া, আমার অন্তঃকরণে যেমন দুঃসহ দুঃখানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল, স্ত্রীজাতির উপর তেমনই প্রগাঢ় ভক্তি জন্মিয়াছিল। এই দোকানের মালিক, পুরুষ হইলে, ঠাকুরদাসের উপর কখনই, এরূপ দয়াপ্রকাশ ও বাৎসল্যপ্রদর্শন করিতেন না। যাহা হউক, যে যে দিন, দিবাভাগে আহারের যোগাড় না হইত, ঠাকুরদাস, সেই সেই দিন, ঐ দয়াময়ীর আশ্বাস-বাক্য অনুসারে, তাঁহার দোকানে গিয়া, পেট ভরিয়া, ফলার করিয়া আসিতেন।

ঠাকুরদাস, মধ্যে মধ্যে, আশ্রয়দাতাকে বলিতেন, যাহাতে আমি, কোনও স্থানে নিযুক্ত হইয়া, মাসিক কিছু কিছু পাইতে পারি, আপনি, দয়া করিয়া, তাহার কোনও উপায় করিয়া দেন। আমি ধর্ম্মপ্রমাণ বলিতেছি, যাঁহার নিকট নিযুক্ত হইব, প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিব, এবং প্রাণান্তেও অধর্ম্মাচরণ করিব না। আমার উপকার করিয়া, আপনাকে কদাচ লজ্জিত হইতে, বা কখনও কোনও কথা শুনিতে হইবেক না। জননী ও ভাই ভগিনী

গুলির কথা যখন মনে হয়, তখন আর ক্ষণকালের জন্যেও, বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে না। এই বলিতে বলিতে, চক্ষের জলে তাঁহার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইত।

কিছু দিন পরে, ঠাকুরদাস, আশ্রয়দাতার সহায়-তায়, মাসিক দুই টাকা বেতনে, কোনও স্থানে নিযুক্ত হইলেন। এই কর্ম্ম পাইয়া, তাঁহার আর আহ্লাদের সীমা রহিল না। পূর্ব্ববৎ আশ্রয়দাতার আশ্রয়ে থাকিয়া, আহারের ক্লেশ সহ্য করিয়াও, বেতনের দুইটি টাকা, যথা নিয়মে, জননীর নিকট পাঠাইতে লাগিলেন। তিনি বিলক্ষণ বুদ্ধিমান ও যার পর নাই পরিশ্রমী ছিলেন, এবং কখনও কোনও ওজর না করিয়া, সকল কর্ম্মই সুন্দররূপে সম্পন্ন করি-তেন; এজন্য, ঠাকুরদাস যখন যাঁহার নিকট কর্ম্ম করিতেন, তাঁহারা সকলেই তাঁহার উপর সাতিশয় সন্তুষ্ট হইতেন।

দুই তিন বৎসরের পরেই, ঠাকুরদাস মাসিক পাঁচ টাকা বেতন পাইতে লাগিলেন। তখন তাঁহার জননীর ও ভাই ভগিনীগুলির, অপেক্ষাকৃ-

অংশে, কষ্ট দূর হইল। এই সময়ে, পিতামহদেবও দেশে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি প্রথমতঃ বনমালিপুরে গিয়াছিলেন; তথায় স্ত্রী, পুত্র, কন্যা দেখিতে না পাইয়া, বীরসিংহে আসিয়া, পরিবারবর্গের সহিত মিলিত হইলেন। সাত আট বৎসরের পর, তাঁহার সমাগমলাভে, সকলেই আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইলেন। শ্বশুরালয়ে, বা শ্বশুরালয়ের সন্নিকটে, বাস করা তিনি অবমাননা জ্ঞান করিতেন, এজন্য, কিছু দিন পরেই, পরিবার লইয়া, বনমালিপুরে যাইতে উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু, দুর্গাদেবীর মুখে ভ্রাতাদের আচরণের পরিচয় পাইয়া, সে উদ্যম হইতে বিরত হইলেন, এবং নিতান্ত অনিচ্ছা পূর্ব্বক, বীরসিংহে অবস্থিতি বিষয়ে সম্মতিপ্রদান করিলেন। এইরূপে, বীরসিংহগ্রামে আমাদের বাস হইয়াছিল।

বীরসিংহে কতিপয় দিবস অতিবাহিত করিয়া, তর্কভুষণ মহাশয়, জ্যেষ্ঠ পুত্র ঠাকুরদাসকে দেখিবার জন্য, কলিকাতা প্রস্থান করিলেন। ঠাকুরদাসের আশ্রয়দাতার মুখে, তদীয় কষ্টসহিষ্ণুতা প্রভৃতির পরিচয় পাইয়া, তিনি যথেষ্ট আশীর্ব্বাদ ও

সবিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। বড়বাজারের দয়েহাঁটায়, উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ ভাগবতচরণ সিংহ নামে এক সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি ছিলেন। এই ব্যক্তির সহিত তর্কভূষণ মহাশয়ের বিলক্ষণ পরিচয় ছিল। সিংহ মহাশয় অতিশয় দয়াশীল ও সদাশয় মনুষ্য ছিলেন, তর্কভূষণ মহাশয়ের মুখে তদীয় দেশত্যাগ অবধি যাবতীয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, প্রস্তাব করিলেন, আপনি অতঃপর ঠাকুরদাসকে আমার বাটীতে রাখুন, আমি তাহার আহার প্রভৃতির ভার লইতেছি; সে যখন স্বয়ং পাক করিয়া খাইতে পারে, তখন আর তাহার, কোনও অংশে, অসুবিধা ঘটিবেক না।

এই প্রস্তাব শুনিয়া, তর্কভূষণ মহাশয়, সাতিশয় আহ্লাদিত হইলেন; এবং ঠাকুরদাসকে সিংহ মহাশয়ের আশ্রয়ে রাখিয়া, বীরসিংহে প্রতিগমন করিলেন। এই অবধি, ঠাকুরদাসের আহারক্লেশের অবসান হইল। যথা সময়ে আবশ্যকমত, দুই বেলা আহার পাইয়া, তিনি পুনর্জ্জন্ম জ্ঞান করিলেন। এই শুভঘটনা দ্বারা, তাঁহার যে কেবল আহারের ক্লেশ

দূর হইল, এরূপ নহে; সিংহ মহাশয়ের সহায়তায়, মাসিক আট টাকা বেতনে এক স্থানে নিযুক্ত হইলেন। ঠাকুরদাসের আট টাকা মাহিয়ানা হইয়াছে, এই সংবাদ শুনিয়া, তদীয় জননী দুর্গাদেবীর আহ্লাদের সীমা রহিল না।

এই সময়ে, ঠাকুরদাসের বয়ঃক্রম তেইশ চব্বিশ বৎসর হইয়াছিল। অতঃপর তাঁহার বিবাহ দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিয়া, তর্কভূষণ মহাশয় গোঘাটনিবাসী রামকান্ত তর্কবাগীশের দ্বিতীয়া কন্যা ভগবতী দেবীর সহিত, তাঁহার বিবাহ দিলেন। এই ভগবতীদেবীর গর্ভে আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি। ভগবতীদেবী, শৈশবকালে, মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। তিনি পিতৃহীনা ছিলেন না; তথাপি, কি কারণে, তাঁহাকে মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হইতে হইয়াছিল, তাহা প্রদর্শিত, ও তৎসমভিব্যাহারে তদীয় মাতুলকুলের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত, হইতেছে।

পাতুলনিবাসী মুখটী পঞ্চানন বিদ্যাবাগীশের চারি পুত্র ও দুই কন্যা। জ্যেষ্ঠ রাধামোহন বিদ্যাভূষণ,

মধ্যম রামধন ন্যায়রত্ন, তৃতীয় গুরুপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, চতুর্থ বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায় ; জ্যেষ্ঠা গঙ্গা, কনিষ্ঠা তারা। বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের নিজ বাটীতেই চতুষ্পাঠী ছিল। এই চতুষ্পাঠীতে, তিনি স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন। তিনি, স্বগ্রামে ও চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহে, সবিশেষ আদরণীয় ও সাতিশয় মাননীয় ছিলেন।

জ্যেষ্ঠা কন্যা গঙ্গা বিবাহযোগ্যা হইলে, বিদ্যাবাগীশ মহাশয়, গোঘাটে একটি সুপাত্র আছে, এই সংবাদ পাইয়া, ঐ গ্রামে উপস্থিত হইলেন। পাত্রের নাম রামকান্ত চট্টোপাধ্যায়। ইনি সাতিশয় বুদ্ধিমান ও নিরতিশয় পরিশ্রমী ছিলেন ; অবাধে অধ্যয়ন করিয়া, একুশ, বাইশ বৎসরে, ব্যাকরণে ও স্মৃতিশাস্ত্রে বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন, এবং তর্কবাগীশ এই উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি অনেকগুলি ছাত্রকে অন্নদান এবং ব্যাকরণে ও স্মৃতিশাস্ত্রে শিক্ষাদান করিতেন। বিদ্যাবাগীশ মহাশয়, এই পাত্রের বুদ্ধি, বিদ্যা ও ব্যবসায়ের পরিচয় পাইয়া, আহ্লাদিতচিত্তে, কন্যাদানে সম্মত হইলেন, এবং

বাটীতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক, পুত্রদের সহিত পরামর্শ করিয়া, রামকান্ত তর্কবাগীশের সহিত, জ্যেষ্ঠা কন্যা গঙ্গার বিবাহ দিলেন।

কালক্রমে, গঙ্গাদেবীর গর্ভে, তর্কবাগীশ মহাশয়ের দুই কন্যা জন্মিল; জ্যেষ্ঠা লক্ষ্মী, কনিষ্ঠা ভগবতী। কিছু দিন পরে, তর্কবাগীশ মহাশয়, সবিশেষ যত্ন ও আগ্রহ সহকারে, তন্ত্রশাস্ত্রের অনুশীলনে সবিশেষ মনোনিবেশ করিলেন। অতঃপর, অধ্যাপনাকার্য্যে তাঁহার তাদৃশ যত্ন রহিল না। তাঁহার অযত্ন দেখিয়া, ছাত্রেরা, ক্রমে ক্রমে, তদীয় চতুষ্পাঠী হইতে চলিয়া যাইতে লাগিলেন। তিনি, তাহাতে ক্ষুব্ধ বা দুঃখিত না হইয়া, অব্যাঘাতে তন্ত্রশাস্ত্রের অনুশীলন করিতে পারিব, এই ভাবিয়া, যার পর নাই আহ্লাদিত হইলেন।

তর্কবাগীশ মহাশয়, অবশেষে, শবসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং, অল্প দিনের মধ্যেই, শবসাধনের সমুচিত ফললাভ করিলেন। শবের উপর উপবিষ্ট হইয়া, জপ করিতে করিতে, তিনি, তুড়ি দিয়া, "মঞ্জুর" বলিয়া, গাত্রোত্থান করিলেন। ফলকথা এই,

সেই অবধি, তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে, উন্মাদগ্রস্ত হইলেন। অতঃপর, কেহ কোনও কথা জিজ্ঞাসিলে, তিনি, তুড়ি দিয়া ও মঞ্জুর বলিয়া, মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিতেন। সময়ে সময়ে, ইহাও অবলোকিত হইত, যখন তিনি একাকী উপবিষ্ট আছেন, কেবল তুড়ি দিতেছেন, ও মঞ্জুর মঞ্জুর বলিতেছেন। তর্ক-বাগীশ মহাশয়ের সহোদর বা অন্য কোনও অভি-ভাবক ছিলেন না। গঙ্গাদেবী, দুই শিশু কন্যা ও উন্মাদগ্রস্ত স্বামী লইয়া, বড় বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া পড়ি-লেন, এবং নিরুপায় ভাবিয়া, স্বীয় পিতা পঞ্চানন বিদ্যাবাগীশের নিকট, এই বিপদের সংবাদ পাঠাই-লেন। বিদ্যাবাগীশ মহাশয়, কন্যা, জামাতা ও দুই দৌহিত্রীকে আপন বাটীতে আনিলেন। এক স্বতন্ত্র চণ্ডীমণ্ডপ উন্মাদগ্রস্ত জামাতার বাসার্থে নিযোজিত হইল; তিনি তথায় অবস্থিতি করিলেন; কন্যা ও দুই দৌহিত্রী পরিবারের মধ্যে বাস করিতে লাগিলেন।

বিদ্যাবাগীশ মহাশয় জামাতার বিশিষ্টরূপ চিকিৎসা করাইলেন; কিছুতেই কোনও উপকার

দর্শিল না। অল্প দিনের মধ্যেই অবধারিত হইল, জামাতা, এজন্মে আর প্রকৃতিস্থ হইতে পারিবেন না। অতঃপর, কন্যা, জামাতা, ও দুই দৌহিত্রীর ভরণপোষণ প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ের ভার বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের উপরেই বর্ত্তিল। তিনিও যথোচিত যত্ন ও স্নেহ সহকারে, তাঁহাদের ভরণপোষণ করিতে লাগিলেন।

বিদ্যাবাগীশ মহাশয় অবিদ্যমান হইলে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধামোহন বিদ্যাভূষণ সংসারের কর্ত্তৃত্ব-পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, মধ্যম রামধন ন্যায়রত্ন পিতার চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা করিতে আরম্ভ করি-লেন, তৃতীয় গুরুপ্রসাদ ও চতুর্থ বিশ্বেশ্বর মুখো-পাধ্যায় কলিকাতায় বিষয়কর্ম্ম করিতে লাগিলেন। চারি সহোদরে, যাবজ্জীবন, একান্নবর্ত্তী ছিলেন; যিনি যে উপার্জন করিতেন, জ্যেষ্ঠের হস্তে দিতেন। জ্যেষ্ঠ, যার পর নাই, সমদর্শী ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। স্বীয় পরিবারের উপর, তাঁহার যেরূপ স্নেহ ও যেরূপ যত্ন ছিল, ভ্রাতাদের পরিবারের পক্ষে, তিনি বরং তাহা অপেক্ষা অধিক স্নেহ ও

অধিক যত্ন করিতেন। ফলকথা এই, তাঁহার কর্ত্তৃত্ব কালে, কেহ কখনও রুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইবার কোনও কারণ দেখিতে পান নাই।

সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, একান্নবর্ত্তী ভ্রাতাদের, অধিক দিন, পরস্পর সদ্ভাব থাকে না; যিনি সংসারে কর্ত্তৃত্ব করেন, তাঁহার পরিবার যেরূপ সুখে ও সচ্ছন্দে থাকেন, অন্য অন্য ভ্রাতাদের পরিবারের পক্ষে, সেরূপ সুখে ও সচ্ছন্দে থাকা, কোনও মতে, ঘটিয়া উঠে না। এজন্য, অল্প দিনেই, ভ্রাতাদের পরস্পর মনান্তর ঘটে; অবশেষে, মুখদেখাদেখি বন্ধ হইয়া, পৃথক হইতে হয়। কিন্তু, সৌজন্য ও মনুষ্যত্ব বিষয়ে চারি জনেই সমান ছিলেন; এজন্য, কেহ, কখনও, ইঁহাদের চারি সহোদরের মধ্যে, মনান্তর বা কথান্তর দেখিতে পান নাই। স্বীয় পরিবারের কথা দূরে থাকুক, ভগিনী, ভাগিনেয়ী, ভাগিনেয়ীদের পুত্রকন্যাদের উপরেও, তাঁহাদের অণুমাত্র বিভিন্ন ভাব ছিল না। ভাগিনেয়ীরা, পুত্রকন্যা লইয়া, মাতুলালয়ে গিয়া, যেরূপ সুখে সমাদরে, কালযাপন করিতেন, কন্যারা, পুত্র

কন্যা লইয়া, পিত্রালয়ে গিয়া, সচরাচর সেরূপ সুখ ও সমাদর প্রাপ্ত হইতে পারেন না।

অতিথির সেবা ও অভ্যাগতের পরিচর্য্যা, এই পরিবারে, যেরূপ যত্ন ও শ্রদ্ধা সহকারে, সম্পাদিত হইত, অন্যত্র প্রায় সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ, ঐ অঞ্চলের কোনও পরিবার এবিষয়ে এই পরিবারের ন্যায়, প্রতিপত্তিলাভ করিতে পারেন নাই। ফলকথা এই, অন্নপ্রার্থনায়, রাধামোহন বিদ্যা-ভুষণের দ্বারস্থ হইয়া, কেহ কখনও প্রত্যাখ্যাত হইয়াছেন, ইহা কাহারও নেত্রগোচর বা কর্ণগোচর হয় নাই। আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, যে অবস্থার লোক হউক, লোকের সংখ্যা যত হউক, বিদ্যাভুষণ মহাশয়ের আবাসে আসিয়া, সকলেই, পরম সমাদরে, অতিথিসেবা ও অভ্যাগতপরিচর্য্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

বিদ্যাভুষণ মহাশয়ের জীবদ্দশায়, এই মুখো-পাধ্যায় পরিবারের, স্বগ্রামে ও পার্শ্ববর্ত্তী বহুতর গ্রামে, আধিপত্যের সীমা ছিল না। এই সমস্ত গ্রামের লোক বিদ্যাভুষণ মহাশয়ের আজ্ঞানুবর্ত্তী

ছিলেন। অনুগত গ্রামবৃন্দের লোকদের বিবাদভঞ্জন, বিপদ্‌মোচন, অসময়ে সাহায্যদান প্রভৃতি কার্য্যই বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের জীবনযাত্রার সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য ছিল। অনেক অর্থ তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল; কিন্তু, সেই অর্থের সঞ্চয়, অথবা স্বীয় পরিবারের সুখসাধনে প্রয়োগ, এক দিন একক্ষণের জন্যেও, তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না। কেবল অন্নদান ও সাহায্যদানেই সমস্ত বিনিযোজিত ও পর্য্যবসিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ, প্রাতঃস্মরণীয় রাধামোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মত, অমায়িক, পরোপকারী, ও ক্ষমতাপন্ন পুরুষ সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায় না।

রাধামোহন বিদ্যাভূষণ ও তদীয় পরিবারবর্গের নিকট, আমরা, অশেষ প্রকারে, যে প্রকার উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার পরিশোধ হইতে পারে না। আমার যখন জ্ঞানোদয় হইয়াছে, মাতৃদেবী, পুত্ত্র কন্যা লইয়া, মাতুলালয়ে যাইতেন, এবং এক যাত্রায়, ক্রমান্বয়ে, পাঁচ ছয় মাস বাস করিতেন; কিন্তু এক দিনের জন্যেও, স্নেহ, যত্ন, ও সমাদরের ত্রুটি

হইত না। বস্তুতঃ, ভাগিনেয়ী ও ভাগিনেয়ীর পুত্রকন্যাদের উপর এরূপ স্নেহপ্রদর্শন অদৃষ্টচর ও অশ্রুতপূর্ব্ব ব্যাপার। জ্যেষ্ঠা ভাগিনেয়ীর মৃত্যু হইলে, তদীয় একবর্ষীয় দ্বিতীয় সন্তান, বিংশতি-বৎসর বয়স পর্য্যন্ত, আত্যন্ত অবিচলিতস্নেহে, প্রতি-পালিত হইয়াছিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আমি পঞ্চমবর্ষীয় হইলাম। বীরসিংহে কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের পাঠশালা ছিল। গ্রামস্থ বালকগণ ঐ পাঠশালায় বিদ্যাভ্যাস করিত। আমি তাঁহার পাঠশালায় প্রেরিত হইলাম। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সাতিশয় পরিশ্রমী এবং শিক্ষাদান বিষয়ে বিলক্ষণ নিপুণ ও সবিশেষ যত্নবান ছিলেন। ইহাঁর পাঠ-শালার ছাত্রেরা, অল্প সময়ে, উত্তমরূপ শিক্ষা করিতে পারিত; এজন্য, ইনি উপযুক্ত শিক্ষক বলিয়া, বিলক্ষণ প্রতিপত্তিলাভ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ, পূজ্যপাদ কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গুরুমহাশয় দলের আদর্শস্বরূপ ছিলেন।

পাঠশালায় এক বৎসর শিক্ষার পর, আমি ভয়ঙ্কর জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়াছিলাম। আমি এ যাত্রা রক্ষা পাইব, প্রথমতঃ এরূপ আশা ছিল না। কিছু দিনের পর, প্রাণনাশের আশঙ্কা নিরাকৃত হইল;

কিন্তু, একবারে বিজ্বর হইলাম না। অধিক দিন জ্বরভোগ করিতে করিতে, প্লীহার সঞ্চার হইল। জ্বর ও প্লীহা উভয় সমবেত হওয়াতে, শীঘ্র আরোগ্য-লাভের সম্ভাবনা রহিল না। ছয় মাস অতীত হইয়া গেল; কিন্তু, রোগের নিবৃত্তি না হইয়া, উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই হইতে লাগিল।

জননীদেবীর জ্যেষ্ঠ মাতুল, রাধামোহন বিদ্যা-ভুষণ, আমার পীড়াবৃদ্ধির সংবাদ পাইয়া, বীরসিংহে উপস্থিত হইলেন, এবং দেখিয়া শুনিয়া, সাতিশয় শঙ্কিত হইয়া, আমাকে আপন আলয়ে লইয়া গেলেন। পাতুলের সন্নিকটে কোটরীনামে যে গ্রাম আছে, তথায় বৈদ্যজাতীয় উত্তম উত্তম চিকিৎসক ছিলেন; তাঁহাদের অন্যতমের হস্তে আমার চিকিৎ-সার ভার অর্পিত হইল। তিন মাস চিকিৎসার পর, সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিলাম। এই সময়ে, আমার উপর, বিদ্যাভুষণ মহাশয়ের ও তদীয় পরিবারবর্গের স্নেহ ও যত্নের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছিল।

কিছু দিন পরে, বীরসিংহে প্রতিপ্রেরিত হই-লাম। এবং পুনরায়, কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের

পাঠশালায় প্রবিষ্ট হইয়া, আট বৎসর বয়স পর্য্যন্ত, তথায় শিক্ষা করিলাম। আমি গুরুমহাশয়ের প্রিয়-শিষ্য ছিলাম। আমার বিলক্ষণ স্মরণ হইতেছে, পাঠশালার সকল ছাত্র অপেক্ষা, আমার উপর তাঁহার অধিকতর স্নেহ ছিল। আমি তাঁহাকে অতিশয় ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতাম। তাঁহার দেহাত্যয়ের কিছু দিন পূর্ব্বে, একবার মাত্র, তাঁহার উপর আমার ভক্তি বিচলিত হইয়াছিল।

——শাকে, * কার্ত্তিক মাসে, পিতামহদেব, রামজয় তর্কভূষণ, অতিসার রোগে আক্রান্ত হইয়া, ছিয়াত্তর বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিলেন। তিনি নিরতিশয় তেজস্বী ছিলেন; কোনও অংশে, কাহারও নিকট অবনত হইয়া চলিতে, অথবা কোনও প্রকারে, অনাদর বা অবমাননা সহ্য করিতে পারিতেন না। তিনি, সকল স্থলে, সকল বিষয়ে, স্বীয়

* পাণ্ডুলিপিতে শাকের উল্লেখ নাই; বোধ হয়, পরে, কাগজ পত্র দেখিয়া বসাইয়া দিবার অভিপ্রায় ছিল। আপাততঃ, সকল কাগজ পত্র আমাদের সন্নিহিত নাই,—ভবিষ্যৎ সংস্করণে, সন্নিবিষ্ট করা যাইবে।

অভিপ্রায়ের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতেন, অন্যদীয় অভিপ্রায়ের অনুবর্ত্তন, তদীয় স্বভাব ও অভ্যাসের সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। উপকার প্রত্যাশায়, অথবা অন্য কোনও কারণে, তিনি কখনও পরের উপাসনা বা আনুগত্য করিতে পারেন নাই। তাঁহার স্থির সিদ্ধান্ত ছিল, অন্যের উপাসনা বা আনুগত্য করা অপেক্ষা প্রাণত্যাগ করা ভাল। তিনি নিতান্ত নিস্পৃহ ছিলেন, এজন্য, অন্যের উপাসনা বা আনুগত্য, তাঁহার পক্ষে, কস্মিন্ কালেও, আবশ্যক হয় নাই।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, তর্কভূষণ মহাশয়, নিতান্ত অনিচ্ছাপূর্ব্বক, বীরসিংহবাসে সম্মত হইয়াছিলেন। তাঁহার শ্যালক, রামসুন্দর বিদ্যাভূষণ, গ্রামের প্রধান বলিয়া পরিগণিত এবং সাতিশয় গর্ব্বিত ও উদ্ধতস্বভাব ছিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, ভগিনীপতি রামজয় তাঁহার অনুগত হইয়া থাকিবেন। কিন্তু, তাঁহার ভগিনীপতি কিরূপ প্রকৃতির লোক, তাহা বুঝিতে পারিলে, তিনি সেরূপ মনে করিতে পারিতেন না। রামজয় রামসুন্দরের অনুগত

হইয়া না চলিলে, রামসুন্দর নানাপ্রকারে তাঁহাকে জব্দ করিবেন, অনেকে তাঁহাকে এই ভয় দেখাইয়া ছিলেন। কিন্তু রামজয়, কোনও কারণে, ভয় পাইবার লোক ছিলেন না; তিনি স্পষ্টবাক্যে বলিতেন, বরং বাসত্যাগ করিব, তথাপি শালার অনুগত হইয়া চলিতে পারিব না। শ্যালকের আক্রোশে, তাঁহাকে, সময়ে সময়ে, প্রকৃতপ্রস্তাবে, একঘরিয়া হইয়া থাকিতে ও নানাপ্রকার অত্যাচার উপদ্রব সহ্য করিতে হইত, তিনি তাহাতে ক্ষুব্ধ বা চলচিত্ত হইতেন না।

তাঁহার শ্যালক প্রভৃতি গ্রামের প্রধানেরা নিরতিশয় স্বার্থপর ও পরশ্রীকাতর ছিলেন; আপন ইষ্টসাধন বা অভিপ্রেত সম্পাদনের জন্য, না করিতে পারিতেন, এমন কর্ম্মই নাই। এতদ্ভিন্ন, সময়ে সময়ে এমন নির্ব্বোধের কার্য্য করিতেন, যে তাঁহাদের কিছু-মাত্র বুদ্ধি ও বিবেচনা আছে, এরূপ বোধ হইত না। এজন্য, তর্কভূষণ মহাশয়, সর্ব্বদা, সর্ব্ব-সমক্ষে, মুক্তকণ্ঠে, বলিতেন, এ গ্রামে একটাও মানুষ নাই, সকলই গরু। এক দিন, তিনি একস্থান

দিয়া চলিয়া যাইতেছেন, ঐ স্থানে, লোকে মলত্যাগ করিত। প্রধান কম্পের এক ব্যক্তি বলিলেন, তর্ক-ভূষণ মহাশয় ওস্থানটা দিয়া যাইবেন না। তিনি বলিলেন, দোষ কি। সে ব্যক্তি বলিলেন, ঐ স্থানে বিষ্ঠা আছে। তিনি, কিয়ৎ ক্ষণ, স্থিরনয়নে নিরীক্ষণ করিয়া, বলিলেন, এখানে বিষ্ঠা কোথায়, আমি গোবর ছাড়া আর কিছু দেখিতে পাইতেছি না; যে গ্রামে একটাও মানুষ নাই, সেখানে বিষ্ঠা কোথা হইতে আসিবেক।

তর্কভুষণ মহাশয় নিরতিশয় অমায়িক ও নিরহঙ্কার ছিলেন; কি ছোট, কি বড়, সর্ব্ববিধ লোকের সহিত, সমভাবে সদয় ও সাদর ব্যবহার করিতেন। তিনি যাঁহাদিগকে কপটবাচী মনে করি-তেন, তাঁহাদের সহিত সাধ্যপক্ষে আলাপ করিতেন না। তিনি স্পষ্টবাদী ছিলেন, কেহ রুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইবেন, ইহা ভাবিয়া, স্পষ্ট কথা বলিতে ভীত বা সঙ্কুচিত হইতেন না। তিনি যেমন স্পষ্টবাদী, তেমনই যথার্থবাদী ছিলেন। কাহারও ভয়ে, বা অনুরোধে, অথবা অন্য কোনও কারণে, তিনি, কখনও কোনও

বিষয়ে অযথা নির্দ্দেশ করেন নাই। তিনি যাঁহা-দিগকে আচরণে ভদ্র দেখিতেন, তাঁহাদিগকেই ভদ্র-লোক বলিয়া গণ্য করিতেন; আর যাঁহাদিগকে আচরণে অভদ্র দেখিতেন, বিদ্বান্, ধনবান্, ও ক্ষমতাপন্ন হইলেও, তাঁহাদিগকে ভদ্রলোক বলিয়া জ্ঞান করিতেন না।

ক্রোধের কারণ উপস্থিত হইলে, তিনি ক্রুদ্ধ হইতেন, বটে; কিন্তু, তদীয় আকারে, আলাপে, বা কার্য্যপরম্পরায়, তাঁহার ক্রোধ জন্মিয়াছে বলিয়া, কেহ বোধ করিতে পারিতেন না। তিনি, ক্রোধের বশীভূত হইয়া, ক্রোধবিষয়ীভূত ব্যক্তির প্রতি কটূক্তি প্রয়োগে, অথবা তদীয় অনিষ্ট চিন্তনে কদাচ প্রবৃত্ত হইতেন না। নিজে যে কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে পারা যায়, তাহাতে তিনি অন্যদীয় সাহায্যের অপেক্ষা করিতেন না; এবং কোনও বিষয়ে, সাধ্যপক্ষে পরাধীন বা পরপ্রত্যাশী হইতে চাহিতেন না। তিনি একাহারী, নিরামিষাশী, সদাচারপূত, ও নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মে সবিশেষ অবহিত ছিলেন। এজন্য, সকলেই তাঁহাকে, সাক্ষাৎ ঋষি বলিয়া, নির্দ্দেশ

করিতেন। বনমালিপুর হইতে প্রস্থান করিয়া, যে আট বৎসর, অনুদ্দেশপ্রায় হইয়াছিলেন; ঐ আট বৎসরকাল কেবল তীর্থপর্য্যটনে অতিবাহিত হইয়াছিল। তিনি দ্বারকা, জ্বালামুখী, বদরিকাশ্রম পর্য্যন্ত পর্য্যটন করিয়াছিলেন।

তর্কভুষণ মহাশয় অতিশয় বলবান, নিরতিশয় সাহসী, এবং সর্ব্বতোভাবে অকুতোভয় পুরুষ ছিলেন। এক লৌহদণ্ড তাঁহার চিরসহচর ছিল; উহা হস্তে না করিয়া, তিনি কখনও বাটীর বাহির হইতেন না। তৎকালে পথে অতিশয় দস্যুভয় ছিল। স্থানান্তরে যাইতে হইলে, অতিশয় সাবধান হইতে হইত। অনেক স্থলে, কি প্রত্যূষে, কি মধ্যাহ্নে, কি সায়াহ্নে, অল্পসংখ্যক লোকের প্রাণনাশ অবধারিত ছিল। এজন্য, অনেকে সমবেত না হইয়া, ঐ সকল স্থলদিয়া যাতায়াত করিতে পারিতেন না। কিন্তু তর্কভুষণ মহাশয়, অসাধারণ বল, সাহস, ও চিরসহচর লৌহদণ্ডের সহায়তায়, সকল সময়ে, ঐ সকল স্থলদিয়া, একাকী নির্ভয়ে যাতায়াত করিতেন। দস্যুরা দুই চারি বার আক্রমণ করিয়াছিল। কিন্তু

উপযুক্তরূপ আক্কেলসেলামি পাইয়া, আর তাহাদের তাঁহাকে আক্রমণ করিতে সাহস হইত না। মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, বন্য হিংস্র জন্তুকেও তিনি ভয়ানক জ্ঞান করিতেন না।

একুশ বৎসর বয়সে, তিনি একাকী মেদিনীপুর যাইতেছিলেন। তৎকালে ঐ অঞ্চলে অতিশয় জঙ্গল ও বাঘ ভালুক প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর ভয়ানক উপদ্রব ছিল। একস্থলে খাল পার হইয়া, তীরে উত্তীর্ণ হইবামাত্র, ভালুকে আক্রমণ করিল। ভালুক নখর-প্রহারে তাঁহার সর্ব্বশরীর ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিল, তিনিও অবিশ্রান্ত লৌহযষ্টি প্রহার করিতে লাগিলেন। ভালুক ক্রমে নিস্তেজ হইয়া পড়িলে, তিনি, তদীয় উদরে উপর্য্যুপরি পদাঘাত করিয়া, তাহার প্রাণসংহার করিলেন। এইরূপে, এই ভয়ঙ্কর শত্রুর হস্ত হইতে নিস্তার পাইলেন, বটে; কিন্তু তৎকৃত ক্ষত দ্বারা তাঁহার শরীরের শোণিত অনবরত বিনির্গত হওয়াতে, তিনি নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই স্থান হইতে মেদিনীপুর প্রায় চারি ক্রোশ অন্তরে অবস্থিত। ঐ অবস্থাতে তিনি অনায়াসে পদব্রজে,

মেদিনীপুরে পঁহুছিলেন, এক আত্মীয়ের বাসায়, দুই মাস কাল, শয্যাগত থাকিলেন, এবং ক্ষত সকল সম্পূর্ণ শুষ্ক হইলে, বাটী প্রত্যাগমন করিলেন। ঐ সকল ক্ষতের চিহ্ন মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাঁহার শরীরে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইত।

পিতৃদেবের ও পিতামহীদেবীর মুখে, সময়ে সময়ে পিতামহদেবসংক্রান্ত যে সকল গল্প শুনিয়াছিলাম, তাহারই স্থূলবৃত্তান্ত উপরিভাগে লিপিবদ্ধ হইল।

পিতামহদেবের দেহাত্যয়ের পর, পিতৃদেব আমায় কলিকাতায় আনা স্থির করিলেন। তদনুসারে, ১২৩৫ সালের কার্ত্তিক মাসের শেষভাগে, আমি কলিকাতায় আনীত হইলাম। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, বড়-বাজার নিবাসী ভাগবতচরণ সিংহ পিতৃদেবকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। তদবধি তিনি তদীয় আবাসেই অবস্থিতি করিতেছিলেন। যে সময়ে আমি কলি-কাতায় আনীত হইলাম, তাহার অনেক পূর্ব্বে সিংহ মহাশয়ের দেহাত্যয় ঘটিয়াছিল। এক্ষণে তদীয় একমাত্র পুত্র জগদ্দুর্লভ সিংহ সংসারের কর্ত্তা। এই সময়ে, জগদ্দুর্লভবাবুর বয়ঃক্রম পঁচিশ বৎসর।

গৃহিণী, জ্যেষ্ঠা ভগিনী, তাঁহার স্বামী ও দুই পুত্র, এক বিধবা কনিষ্ঠা ভগিনী ও তাঁহার এক পুত্র, এইমাত্র তাঁহার পরিবার। জগদ্দুর্লভবাবু পিতৃদেবকে পিতৃব্যশব্দে সম্ভাষণ করিতেন; সুতরাং আমি তাঁহার ও তাঁহার ভগিনীদিগের ভ্রাতৃস্থানীয় হইলাম। তাঁহাকে দাদা মহাশয়, তাঁহার ভগিনীদিগকে, বড় দিদি ও ছোট দিদি বলিয়া সম্ভাষণ করিতাম।

এই পরিবারের মধ্যে অবস্থিত হইয়া, পরের বাটীতে আছি বলিয়া, এক দিনের জন্যেও আমার মনে হইত না। সকলেই যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। কিন্তু, কনিষ্ঠা ভগিনী রাইমণির অদ্ভুত স্নেহ ও যত্ন, আমি, কস্মিন্ কালেও, বিস্মৃত হইতে পারিব না। তাঁহার একমাত্র পুত্র গোপালচন্দ্র ঘোষ আমার প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন। পুত্রের উপর জননীর যেরূপ স্নেহ ও যত্ন থাকা উচিত ও আবশ্যক, গোপালচন্দ্রের উপর রাইমণির স্নেহ ও যত্ন তদপেক্ষা অধিকতর ছিল, তাহার সংশয় নাই। কিন্তু আমার আন্তরিক দৃঢ় বিশ্বাস এই, স্নেহ ও যত্ন বিষয়ে,

আমায় ও গোপালে রাইমণির অণুমাত্র বিভিন্ন-ভাব ছিল না। ফলকথা এই, স্নেহ, দয়া, সৌজন্য, অমায়িকতা, সদ্বিবেচনা প্রভৃতি সদ্‌গুণ বিষয়ে, রাইমণির সমকক্ষ স্ত্রীলোক এপর্য্যন্ত আমার নয়ন-গোচর হয় নাই। এই দয়াময়ীর সৌম্যমূর্ত্তি, আমার হৃদয়মন্দিরে, দেবীমূর্ত্তির ন্যায়, প্রতিষ্ঠিত হইয়া, বিরাজমান রহিয়াছে। প্রসঙ্গ ক্রমে, তাঁহার কথা উত্থাপিত হইলে, তদীয় অপ্রতিম গুণের কীর্ত্তন করিতে করিতে, অশ্রুপাত না করিয়া থাকিতে পারি না। আমি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী বলিয়া, অনেকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। আমার বোধ হয়, সে নির্দ্দেশ অসঙ্গত নহে। যে ব্যক্তি রাইমণির স্নেহ, দয়া, সৌজন্য প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করিয়াছে, এবং ঐ সমস্ত সদ্‌গুণের ফলভোগী হইয়াছে, সে যদি স্ত্রী-জাতির পক্ষপাতী না হয়, তাহা হইলে, তাহার তুল্য কৃতঘ্ন পামর ভূমণ্ডলে নাই। আমি পিতা-মহীদেবীর একান্ত প্রিয় ও নিতান্ত অনুগত ছিলাম। কলিকাতায় আসিয়া, প্রথমতঃ কিছু দিন, তাঁহার জন্য, যারপর নাই, উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলাম। সময়ে

সময়ে, তাঁহাকে মনে করিয়া কাঁদিয়া ফেলিতাম। কিন্তু দয়াময়ী রাইমণির স্নেহে ও যত্নে, আমার সেই বিষম উৎকণ্ঠা ও উৎকট অসুখের অনেক অংশে নিবারণ হইয়াছিল।

এই সময়ে, পিতৃদেব, মাসিক দশ টাকা বেতনে, জোড়াসাঁকোনিবাসী রামসুন্দর মল্লিকের নিকট নিযুক্ত ছিলেন। বড়বাজারের চকে মল্লিক মহাশয়ের এক দোকান ছিল। ঐ দোকানে লোহা ও পিতলের নানাবিধ বিলাতি জিনিস বিক্রীত হইত। যে সকল খরিদদার ধারে জিনিস কিনি-তেন, তাঁহাদের নিকট হইতে পিতৃদেবকে টাকা আদায় করিয়া আনিতে হইত। প্রতিদিন, প্রাতে এক প্রহরের সময়, কর্ম্মস্থানে যাইতেন; রাত্রি এক প্রহরের সময়, বাসায় আসিতেন। এ অবস্থায়, অন্যত্র বাসা হইলে, আমার মত পল্লীগ্রামের অষ্টমবর্ষীয় বালকের পক্ষে, কলিকাতায় থাকা কোনও মতে চলিতে পারিত না।

জগদ্দুর্লভবাবুর বাটীর অতি সন্নিকটে, শিবচরণ মল্লিক নামে এক সম্পন্ন সুবর্ণবণিক ছিলেন।

তাঁহার বাটীতে একটি পাঠশালা ছিল। ঐ পাঠশালায় তাঁহার পুত্র, ভাগিনেয়, জগদ্দুর্লভবাবুর ভাগিনেয়েরা, ও আর তিন চারিটি বালক শিক্ষা করিতেন। কলিকাতায় উপস্থিতির পাঁচ সাত দিন পরেই, আমি ঐ পাঠশালায় প্রেরিত হইলাম। অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, এই তিন মাস তথায় শিক্ষা করিলাম। পাঠশালার শিক্ষক স্বরূপচন্দ্র দাস, বীরসিংহের শিক্ষক কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায় অপেক্ষা, শিক্ষাদান বিষয়ে, বোধ হয়, অধিকতর নিপুণ ছিলেন।

ফাল্গুন মাসের প্রারম্ভে আমি রক্তাতিসাররোগে আক্রান্ত হইলাম। ঐ পল্লীতে দুর্গাদাস কবিরাজ নামে চিকিৎসক ছিলেন; তিনি আমার চিকিৎসা করিলেন। রোগের নিবৃত্তি না হইয়া, উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই হইতে লাগিল। কলিকাতায় থাকিলে, আরোগ্যলাভের সম্ভাবনা নাই, এই স্থির করিয়া, পিতৃদেব বাটীতে সংবাদ পাঠাইলেন। সংবাদ পাইবামাত্র, পিতামহীদেবী, অস্থির হইয়া, কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন, এবং দুই তিন দিন

অবস্থিতি করিয়া, আমায় লইয়া বাটী প্রস্থান করিলেন। বাটীতে উপস্থিত হইয়া, বিনা চিকিৎসায়, সাত আট দিনেই, আমি সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হইলাম।

জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রারম্ভে, আমি পুনরায় কলিকাতায় আনীত হইলাম। প্রথমবার কলিকাতায় আসিবার সময়, একজন ভৃত্য সঙ্গে আসিয়াছিল। কিয়ৎ ক্ষণ চলিয়া, আর চলিতে না পারিলে, ঐ ভৃত্য খানিক আমায় কাঁধে করিয়া লইয়া আসিত। এবার আসিবার পূর্ব্বে, পিতৃদেব আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন চলিয়া যাইতে পারিবে, না লোক লইতে হইবেক। আমি বাহাদুরি করিয়া বলিলাম, লোক লইতে হইবেক না, আমি অনায়াসে চলিয়া যাইতে পারিব। তদনুসারে আর লোক লওয়া আবশ্যক হইল না। পিতৃদেব আমায় লইয়া বাটী হইতে বহির্গত হইলেন। মাতৃদেবীর মাতুলালয় পাতুল বীরসিংহ হইতে ছয় ক্রোশ দূরবর্ত্তী। এই ছয় ক্রোশ অবলীলাক্রমে চলিয়া আসিলাম। সে দিন পাতুলে অবস্থিতি করিলাম।

তারকেশ্বরের নিকটবর্ত্তী রামনগর নামক গ্রাম আমার কনিষ্ঠা পিতৃষ্বসা অন্নপূর্ণাদেবীর শ্বশুরালয়। ইতিপূর্ব্বে অন্নপূর্ণাদেবী অসুস্থ হইয়াছিলেন; এজন্য, পিতৃদেব, কলিকাতায় আসিবার সময়, তাঁহাকে দেখিয়া যাইবেন, স্থির করিয়াছিলেন। তদনুসারে, আমরা পরদিন প্রাতঃকালে, রামনগর অভিমুখে প্রস্থান করিলাম। রামনগর পাতুল হইতে ছয় ক্রোশ দূরবর্ত্তী। প্রথম দুই তিন ক্রোশ অনায়াসে চলিয়া আসিলাম। শেষ তিন ক্রোশে বিষম সঙ্কট উপস্থিত হইল। তিন ক্রোশ চলিয়া, আমার পা এত টাটাইল, যে আর ভূমিতে পা পাতিতে পারা যায় না। ফলকথা এই, আর আমার চলিবার ক্ষমতা কিছুমাত্র রহিল না। অনেক কষ্টে চারি পাঁচ দণ্ডে আধ ক্রোশের অধিক চলিতে পারিলাম না। বেলা দুই প্রহরের অধিক হইল, এখনও দুই ক্রোশের অধিক পথ বাকী রহিল।

আমার এই অবস্থা দেখিয়া, পিতৃদেব বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। আগের মাঠে ভাল তরমুজ পাওয়া যায়, শীঘ্র চলিয়া আইস, ঐখানে তরমুজ

কিনিয়া খাওয়াইব। এই বলিয়া তিনি লোভপ্রদর্শন করিলেন; এবং অনেক কষ্টে ঐ স্থানে উপস্থিত হইলে, তরমুজ কিনিয়া খাওয়াইলেন। তরমুজ বড় মিষ্ট লাগিল। কিন্তু পার টাটানি কিছুই কমিল না। বরং খানিক বসিয়া থাকাতে, দাঁড়াইবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত রহিল না। ফলতঃ, আর এক পা চলিতে পারি, আমার সেরূপ ক্ষমতা রহিল না। পিতৃদেব অনেক ধমকাইলেন, এবং তবে তুই এই মাঠে একলা থাক, এই বলিয়া, ভয় দেখাইবার নিমিত্ত, আমায় ফেলিয়া খানিক দূর চলিয়া গেলেন। আমি উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলাম। পিতৃ-দেব সাতিশয় বিরক্ত হইয়া, কেন তুই লোক আনিতে দিলি না, এই বলিয়া যথোচিত তিরস্কার করিয়া, দুই একটা থাবড়াও দিলেন।

অবশেষে নিতান্ত নিরুপায় ভাবিয়া, পিতৃদেব আমায় কাঁধে করিয়া লইয়া চলিলেন। তিনি স্বভাবতঃ দুর্ব্বল ছিলেন, অষ্টমবর্ষীয় বালককে স্কন্ধে লইয়া অধিক দূর যাওয়া তাঁহার ক্ষমতার বহির্ভূত। সুতরাং খানিক গিয়া আমায় স্কন্ধ হইতে নামাই-

লেন এবং বলিলেন, বাবা খানিক চলিয়া আইস, আমি পুনরায় কাঁধে করিব। আমি চলিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কিছুতেই চলিতে পারিলাম না। অতঃপর, আর আমি চলিতে পারিব, সে প্রত্যাশা নাই দেখিয়া, পিতৃদেব খানিক আমায় স্কন্ধে করিয়া লইতে লাগিলেন, খানিক পরেই ক্লান্ত হইয়া, আমায় নামাইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। এইরূপে দুই ক্রোশ পথ যাইতে প্রায় দেড়প্রহর লাগিল। সায়ংকালের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আমরা রাম-নগরে উপস্থিত হইলাম, এবং তথায় সে রাত্রি বিশ্রাম করিয়া, পরদিন শ্রীরামপুরে থাকিয়া, তৎপর দিন কলিকাতায় উপস্থিত হইলাম।

গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় যত দূর শিক্ষা দিবার প্রণালী ছিল, কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের ও স্বরূপ-চন্দ্র দাসের নিকট আমার সে পর্য্যন্ত শিক্ষা হইয়াছিল। অতঃপর কিরূপ শিক্ষা দেওয়া উচিত, এ বিষয়ে পিতৃদেবের আত্মীয়বর্গ, স্ব স্ব ইচ্ছার অনুযায়ী পরামর্শ দিতে লাগিলেন। শিক্ষা বিষয়ে আমার কিরূপ ক্ষমতা আছে, এ বিষয়ের আলো-

চনা হইতে লাগিল। সেই সময়ে, প্রসঙ্গক্রমে, পিতৃদেব মাইল ষ্টোনের উপাখ্যান বলিলেন। সে উপাখ্যান এই—

প্রথমবার কলিকাতায় আসিবার সময়, সিয়াখালায় সালিখার বাঁধারাস্তায় উঠিয়া, বাটনাবাটা শিলের মত একখানি প্রস্তর রাস্তার ধারে পোতা দেখিতে পাইলাম। কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া, পিতৃদেবকে জিজ্ঞাসিলাম, বাবা, রাস্তার ধারে শিল পোতা আছে কেন। তিনি, আমার জিজ্ঞাসা শুনিয়া, হাস্যমুখে কহিলেন, ও শিল নয়, উহার নাম মাইল ষ্টোন। আমি বলিলাম, বাবা, মাইল ষ্টোন কি, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। তখন তিনি বলিলেন, এটি ইঙ্গরেজী কথা, মাইল শব্দের অর্থ আধ ক্রোশ; ষ্টোন শব্দের অর্থ পাথর; এই রাস্তার আধ আধ ক্রোশ অন্তরে, এক একটি পাথর পোতা আছে; উহাতে এক, দুই, তিন প্রভৃতি অঙ্ক খোদা রহিয়াছে; এই পাথরের অঙ্ক উনিশ; ইহা দেখিলেই লোকে বুঝিতে পারে, এখান হইতে কলিকাতা উনিশ মাইল, অর্থাৎ, সাড়ে নয় ক্রোশ।

এই বলিয়া, তিনি আমাকে ঐ পাথরের নিকট লইয়া গেলেন।

নামতায় "একের পিঠে নয় উনিশ" ইহা শিখিয়াছিলাম। দেখিবামাত্র আমি প্রথমে এক অঙ্কের, তৎ পরে নয় অঙ্কের উপর হাত দিয়া বলিলাম, তবে এইটি ইঙ্গরেজীর এক, আর এইটি ইঙ্গরেজীর নয়। অনন্তর বলিলাম, তবে বাবা, ইহার পর যে পাথরটি আছে, তাহাতে আঠার, তাহার পরটিতে সতর, এইরূপে ক্রমে ক্রমে এক পর্য্যন্ত অঙ্ক দেখিতে পাইব। তিনি বলিলেন, আজ দুই পর্য্যন্ত অঙ্ক দেখিতে পাইবে, প্রথম মাইল ষ্টোন যেখানে পোতা আছে, আমরা সে দিক দিয়া যাইব না। যদি দেখিতে চাও, এক দিন দেখাইয়া দিব। আমি বলিলাম, সেটি দেখিবার আর দরকার নাই; এক অঙ্ক এইটিতেই দেখিতে পাইয়াছি। বাবা, আজ পথে যাইতে যাইতেই, আমি ইঙ্গরেজীর অঙ্কগুলি চিনিয়া ফেলিব।

এই প্রতিজ্ঞা করিয়া, প্রথম মাইল ষ্টোনের নিকটে গিয়া, আমি অঙ্কগুলি দেখিতে ও চিনিতে

আরম্ভ করিলাম। মনবেড় চটীতে দশম মাইল ষ্টোন দেখিয়া, পিতৃদেবকে সম্ভাষণ করিয়া বলিলাম, বাবা আমার ইঙ্গরেজী অঙ্ক চিনা হইল। পিতৃদেব বলি- লেন, কেমন চিনিয়াছ, তাহার পরীক্ষা করিতেছি। এই বলিয়া, তিনি নবম, অষ্টম, সপ্তম, এই তিনটি মাইল ষ্টোন ক্রমে ক্রমে দেখাইয়া জিজ্ঞাসিলে, আমি এটি নয়, এটি আট, এটি সাত, এইরূপ বলিলাম। পিতৃদেব ভাবিলেন, আমি যথার্থই অঙ্ক- গুলি চিনিয়াছি, অথবা নয়ের পর আট, আটের পর সাত অবধারিত আছে, ইহা জানিয়া, চালাকি করিয়া, নয়, আট, সাত বলিতেছি। যাহা হউক, ইহার পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত, কৌশল করিয়া, তিনি আমাকে ষষ্ঠ মাইল ষ্টোনটি দেখিতে দিলেন না; অনন্তর, পঞ্চম মাইল ষ্টোনটি দেখাইয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, এটি কোন মাইল ষ্টোন বল দেখি। আমি দেখিয়া বলিলাম, বাবা, এই মাইল ষ্টোনটি খুদিতে ভুল হইয়াছে; এটি ছয় হইবেক, না হইয়া পাঁচ খুদিয়াছে।

এই কথা শুনিয়া, পিতৃদেব ও তাঁহার সমভি-

ব্যাহারীরা অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছেন, ইহা তাঁহাদের মুখ দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম। বীরসিংহের গুরুমহাশয় কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ও ঐ সমভিব্যাহারে ছিলেন; তিনি আমার চিবুকে ধরিয়া "বেস বাবা বেস" এই কথা বলিয়া, অনেক আশীর্ব্বাদ করিলেন, এবং পিতৃদেবকে সম্বোধিয়া বলিলেন, দাদামহাশয়, আপনি ঈশ্বরের লেখা পড়া বিষয়ে যত্ন করিবেন। যদি বাঁচিয়া থাকে, মানুষ হইতে পারিবেক। যাহা হউক, আমার এই পরীক্ষা করিয়া, তাঁহারা সকলে যেমন আহ্লাদিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের আহ্লাদ দেখিয়া, আমিও তদনুরূপ আহ্লাদিত হইয়াছিলাম।

মাইল ষ্টোনের উপাখ্যান শুনিয়া, পিতৃদেবের পরামর্শদাতা আত্মীয়েরা একবাক্য হইয়া, "তবে ইহাকে রীতিমত ইঙ্গরেজী পড়ান উচিত" এই ব্যবস্থা স্থির করিয়া দিলেন। কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে, সিদ্ধেশ্বরী তলার ঠিক পূর্ব্বদিকে একটি ইঙ্গরেজী বিদ্যালয় ছিল। উহা হের সাহেবের স্কুল বলিয়া প্রসিদ্ধ। পরামর্শদাতারা ঐ বিদ্যালয়ের উল্লেখ করিয়া, বলি-

লেন, উহাতে ছাত্রেরা বিনা বেতনে শিক্ষা পাইয়া থাকে; ঐ স্থানে ইহাকে পড়িতে দাও; যদি ভাল শিখিতে পারে, বিনা বেতনে হিন্দু কালেজে পড়িতে পাইবেক; হিন্দুকালেজে পড়িলে ইঙ্গরেজীর চূড়ান্ত হইবেক। আর, যদি তাহা না হইয়া উঠে, মোটা-মুটি শিখিতে পারিলেও, অনেক কাজ দেখিবেক, কারণ, মোটামুটি ইঙ্গরেজী জানিলে, হাতের লেখা ভাল হইলে, ও যেমন তেমন জমাখরচ বোধ থাকিলে, সওদাগর সাহেবদিগের হৌসে ও সাহেব-দের বড় বড় দোকানে অনায়াসে কর্ম্ম করিতে পারিবেক।

আমরা পুরুষানুক্রমে সংস্কৃতব্যবসায়ী; পিতৃদেব অবস্থার বৈগুণ্য বশতঃ, ইচ্ছানুরূপ সংস্কৃত পড়িতে পারেন নাই; ইহাতে তাঁহার অন্তঃকরণে অতিশয় ক্ষোভ জন্মিয়াছিল। তিনি সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়া-ছিলেন, আমি রীতিমত সংস্কৃত শিখিয়া চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা করিব। এজন্য পূর্ব্বোক্ত পরামর্শ তাঁহার মনোনীত হইল না। তিনি বলিলেন, উপার্জ্জনক্ষম হইয়া, আমার দুঃখ ঘুচাইবেক, আমি সে উদ্দেশে

ঈশ্বরকে কলিকাতায় আনি নাই। আমার একান্ত অভিলাষ, সংস্কৃত শাস্ত্রে কৃতবিদ্য হইয়া দেশে চতুষ্পাঠী করিবেক, তাহা হইলেই আমার সকল ক্ষোভ দূর হইবেক। এই বলিয়া, তিনি আমায় ইঙ্গরেজী স্কুলে প্রবেশ বিষয়ে, আন্তরিক অসম্মতি প্রদর্শন করিলেন। তাঁহারা অনেক পীড়াপীড়ি করিলেন, তিনি কিছুতেই সম্মত হইলেন না।

মাতৃদেবীর মাতুল রাধামোহন বিদ্যাভূষণের পিতৃব্যপুত্র মধুসূদন বাচস্পতি সংস্কৃত কালেজে অধ্যয়ন করিতেন। তিনি পিতৃদেবকে বলিলেন, আপনি ঈশ্বরকে সংস্কৃত কালেজে পড়িতে দেন, তাহা হইলে, আপনকার অভিপ্রেত সংস্কৃত শিক্ষা সম্পন্ন হইবেক; আর যদি চাকরী করা অভিপ্রেত হয়, তাহারও বিলক্ষণ সুবিধা আছে; সংস্কৃত কালেজে পড়িয়া, যাহারা ল কমিটীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, তাহারা আদালতে জজপণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হইয়া থাকে। অতএব, আমার বিবেচনায়, ঈশ্বরকে সংস্কৃত কালেজে পড়িতে দেওয়াই উচিত। চতুষ্পাঠী অপেক্ষা কালেজে রীতিমত সংস্কৃত শিক্ষা

হইয়া থাকে। বাচস্পতি মহাশয় এই বিষয় বিলক্ষণ রূপে পিতৃদেবের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিলেন। অনেক বিবেচনার পর, বাচস্পতি মহাশয়ের ব্যবস্থাই অবলম্বনীয় স্থির হইল।
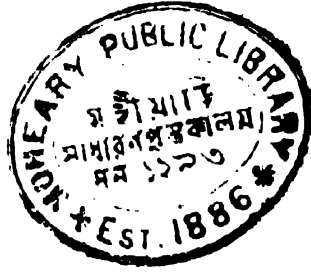
PRINTED BY UPENDRA NATHA CHAKRAVARTI,
AT THE SANSKRIT PRESS,
No. 62, AMHERST STREET, CALCUTTA.
1891